অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। বৈশাখের রুদ্র ঝড়ে ।।

আজ পহেলা বৈশাখ। নববর্ষ। প্রতিবারের মত অর্থাৎ প্রতিবছর এই দিনে সবাই যখন আনন্দে আত্মহারা তখন আসিফ সাহেব দোতালার রেলিংটা ধরে তাকিয়ে থাকেন বাইরে। এমনি তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন চেয়ারটা টেনে বসেন। সকালের খবরের কাগজ গুলোতো চোখ বোলাবার চেষ্টা করেন। এরই মাঝে এককাপ চা দিয়ে যান গোধূলী - আসিফ সাহেবের স্ত্রী। আজকের এই দিনে আসিফ সাহেবকে বাড়ীর কেউ বিরক্ত করে না। ওঁকে একাকী থাকতে সাহায্য করে সবাই।

তিরিশ বছরের সংসার আসিফ সাহেবের। দুটি ছেলে তারা দু'জনেই বিদেশে। ছেলেরাও জানে তাদের বাবা সেই একাত্তরের পর থেকে আর বৈশাখী মেলায় যান না। ছোট বেলায় কখনো সখনো জোরাজুরি করলে মা ওদেরকে মেলায় নিয়ে যেতেন। রমনার এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে আবার বাসায়। যখন কলেজে পড়া শুরু হলো তখন ওরা নিজেরাই মেলায় যেতো। মা আর বাবা বাড়ীতেই থাকতো।

গোধূলীর সাথে আসিফ সাহেবের বিয়ের শুরু থেকে এটা একটা অলিখিত চুক্তি যে গোধূলী কখনো আসিফ সাহেবকে বৈশাখী মেলায় যেতে চাপাচাপি করবে না। প্রথম প্রথম রাগ অভিমান একটু আধটু হলেও পরে পারিবারিক শান্তির জন্য গোধূলী তা মেনে নিয়েছে। শুধু মেনে নেয়া নয় পরবর্তীতে আসিফ সাহেবের এই মনভাবকে রীতিমত সন্মান করে আসছে গোধূলী। করবেই বা না কেন? আসিফ সাহেবের মত একজন মানুষের ঘরণী হওয়া কেবলই ভাগ্যের ব্যপার বলে মনে করে গোধূলী। স্বামীর বিরুদ্ধে ওর কোন অভিযোগ নেই। আসিফ সাহেব তার সুযোগও রাখেন না কখনো। এতোই ভালোবাসেন গোধূলীকে।

ভালো বেসেছিলেন আর একজনকে। বৈশাখী মেলাতেই তার সাথে আসিফ সাহেবের প্রথম দেখা। প্রথম পরিচয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সবে ঢুকেছেন। তখন আসিফ সাহেবের বাবা মা এঁরা সবাই থাকতেন মফঃস্বল শহরে। ঢাকা শহরে নতুন। আর সেবারেই প্রথম রমনার মেলায়। অন্য সবার মত রাস্তার ধার দিয়ে ছুটছেন আসিফ সাহেব। হঠাৎ একটি মেয়েলী কন্ঠস্বরে থমকে গেলেন -
আমাকে ডাকছেন?
জ্বি আপনাকেই। আপনার কাছে দশ টাকার ভাংতি হবে?
মনে হয় হবে।
প্লিজ দেখুন না। এতো লোকের মধ্যে কোথায় কার কাছে গিয়ে খুঁজবো। রিকশাআলার কাছে কোন ভাংতি নেই। তার ভাড়া টা দিতে পারছি না।

আসিফ সাহেব পকেট হাতিয়ে বের করেছেন আট টাকা। বললেন পুরো ভাংতি নেই - ওকে কত দিতে হবে?
তিন টাকা।
বেশ আপাততঃ ওকে তিন টাকা দিয়ে বিদায় করি তারপর দেখা যাবে।

শেষমেশ তারা দেখেছে বটে। কার মাঝে দু'জন কী যে দেখতে পেলো তা কেবল তারাই জানে, শুধু জানে না এর শেষটা কোথায়। কী এক নেশার মধ্যে দু'জনে ডুবে গেলো। মনে হয় চন্দ্রাকে ছাড়া আসিফ সাহেবের জীবন অসম্ভব। চন্দ্রা আসিফ সাহেবকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে যার কোন সীমানা নেই। বৈশাখী মেলা দিয়ে শুরু তাই পহেলা বৈশাখ ওদের দু'জনার সব'চে আনন্দের দিন। একজন আরেকজনকে পাওয়ার দিন।

এরই মধ্যে উত্তাল দেশ। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন। চন্দ্রাকে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে নীলফামারী পাঠিয়ে দিয়েছেন আসিফ সাহেব। তারপর সেই পঁচিশে মার্চ্চের কালো রাত্রি। দেখি কী হয়, দেখি কী হয় করতে করতে পঁচিশে মার্চ্চ অবদি ঢাকাতেই থেকে গেলেন। পাশাপাশি তাঁর সামরিক প্রশিক্ষণও চলছে। পঁচিশে মার্চ্চের রাতের আক্রমণে আর টিকতে পারেননি। দিশেহারা হয়ে কেবল ছুটছেন। এ ছোটার কোন বিরাম নেই। অবশেষে থামলেন শরণার্থী শিবিরে এসে। দিন কয়েক পর ট্রেনিং এ দেরাদুন। তারপর স্বাধীনতা যুদ্ধের লড়াকু আসিফ।

যুদ্ধ শেষে প্রথমে বাড়ী ফিরলেন আসিফ সাহেব। তারপর নীলফামারী। সারা দেশের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। তারই মাঝে কখনো পাঁয়ে হেঁটে কখনো বা ভ্যান গাড়ী আবার কখনো বা মুড়িরটিন মার্কা বাসে তবু পৌঁছাতে হবে নীলফামারী। খুঁজে বের করতেই হবে চন্দ্রাকে।

খোঁজ পাওয়া গেলো চন্দ্রাদের বাড়ীর কিন্তু পাওয়া গেলো না তার কোন খোঁজ। পরিবারের কেউ ঠিক মত বলে না চন্দ্রা কোথায়। বরং সকলেই বিরক্ত। কোথাকার কোন লোক এসে চন্দ্রার খোঁজ করছে। চন্দ্রার পরিবারের কেউ তো চন্দ্রাকে নিয়ে কোন কথা বলতে চায় না।

কেউ দিলো না চন্দ্রার কোন খোঁজ। প্রচন্ড খারাপ মন। তেমনি খিদেও। এলাকার চায়ের দোকানে ঢুকে ডালপুরী আর চা খেতে লাগলেন আসিফ সাহেব। এলাকায় নতুন মুখ দেখে উপস্থিত নানা জনের নানান সব প্রশ্ন। কেউ কেউ আবার পলাতক রাজাকার ভেবে সন্দেহ করছেন। এক সময়ে দোকানী নিজেই জানতে চাইলেন আসিফ সাহেবের পরিচয়। তিনি বললেন সবে মুক্তিযুদ্ধ শেষ করে ফিরলেন। বাড়ী শান্তাহার। এসেছেন চন্দ্রার খোঁজে। চন্দ্রার নাম বলতেই সবাই চুপ হয়ে গেলো। কেউ কেউ নিঃশব্দে দোকান ছেড়ে চলে গেলো। এক সময়ে দোকানী বললেন - আপনি বাড়ী ফিরে যান। যাকে খুঁজছেন তাকে আর পাবেন না কোনদিন।

জ্ঞান ফিরে এলে আসিফ সাহেব চোখ মেলে দেখলেন সেই দোকানী আর তাঁর স্ত্রী যিনি তখনো আসিফ সাহেবের মাথায় পানি ঢেলে যাচ্ছেন। বলছেন চন্দ্রার মত এমন মেয়ে আমাদের এ তল্লাটে আর দুটো ছিলো না। সবাই খুব আদর করতো তারে। যে রাতে খান সেনারা তাকে ধরে নিয়ে যায় সে রাতে সারা এলাকার লোক পাগলের মত চন্দ্রাকে খুঁজেছে। কিন্তু কেউ তার কোন খোঁজ পায়নি।

এক দুই করে নয় দিন পার হলো তবু তার খোঁজ পাওয়া গেলো না। দশ দিনের দিন ওই শিমুল গাছে চন্দ্রার দেহ খান ঝোলানো দেখলো সবাই। কিন্তু কেউ জানেনা চন্দ্রা কী আত্মহত্যা করেছে না ওকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে। নাকি অন্য কিছু এর মধ্যে আছে আজ পর্য্যন্ত কেউ তা জানতে পারলো না।

জানতে পারেননি আসিফ সাহেবও। আজো তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না চন্দ্রা আত্মহত্যা করেছে। সেই থেকে আসিফ সাহেব আর বৈশাখী মেলায় যান না। গোধূলীকে সেটা শুরুতেই বলে নিয়েছিলেন। গোধূলীও সেটা মেনে নিয়েছে। এই একটা দিন গোধূলী আসিফ সাহেবকে সঁপে দেন চন্দ্রার কাছে। একজন বীরঙ্গণাকে সম্মান দেয়ার এর চেয়ে বড় উৎসর্গ আর কীইবা হতে পারে গোধূলীর।

লাঞ্চ খাবে এখন?
হাতটা বাড়িয়ে গোধূলীর হাত ধরেন আসিফ সাহেব। বলেন - থাক চলো আজ বাইরে কোথাও খাই।
কী দরকার এখন আবার বাইরে যাবার। আজকে আমি তোমার পছন্দের মাছ রান্না করেছি। কাল না হয় বাইরে যাবো খেতে। এসো চলো - খাওয়ার পরে তোমাকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবো।
চলো।
চলো যাই।